অধ্যায়-১৩ : আধুনিক বাংলা গল্পপাঠ -৩

বিষয় বিন্যাস

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১৩.২ পরিচিতি
১৩.৩ ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ বিচার
১৩.৪ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও প্রতিভা
১৩.৫ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প-পরিচিতি ও নির্বাচিত গল্পের আলোচনা
১৩.৬ আলোচিত গল্পের সারসংক্ষেপ
১৩.৭ চরিত্র
১৩.৮ নামকরণ
১৩.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ
১৩.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১৩.১১ অতিরিক্ত পঠন
১৩.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১৩.১৩ আর্দশ প্রশ্নাবলি

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

আপনাদের পাঠভুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। তবে সৃষ্টিকে বুঝতে হলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন স্রষ্টাকে। এজন্য মূল গল্পগুলিতে প্রবেশের আগে আমরা জেনে নেব নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন, সাহিত্যকৃতি এবং তাঁর মানসগঠন সম্পর্কে। মানুষের সুখ-দুঃখের নানা কাহিনি বুননে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মনস্তত্ত্বের গভীরেও তাঁর চলাফেরা ছিল অনায়াস। আপনাদের পাঠ্য গল্পগুলি সেই সিদ্ধিরই প্রকাশ।

তবে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে ছোটগল্পের সংজ্ঞা। জানা আবশ্যক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি। মূল পাঠে মনোনিবেশ করার পূর্বভূমিকা হিসেবে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা করব বাংলা গল্পবিশ্বের। আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আপনারা জানতে পারবেন-

- ছোটগল্পের সংজ্ঞা।
- বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস।
- ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ।
- বাংলা ছোটগল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্বসূরী লেখকদের সম্পর্কে।
- সমকালীন গল্পলেখকদের সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পার্থক্য।
- বাংলা ছোটগল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবস্থান।

• নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রকৃতি।
• মনস্তত্ব ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
• নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণনাভঙ্গি, প্লট, ভাষা।
• নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে পর্ব-বিভাজন এবং বিভিন্ন পর্বের গল্পগুলি সম্পর্কে।

১৩.২ পরিচিতি

মাসিক বা সাময়িক পত্রিকাকে অবলম্বন করেই বাংলা ছোটগল্পের প্রসার ও ব্যাপ্তিলাভ ঘটেছে। প্রাক্-রবীন্দ্র পর্বে 'বঙ্গদর্শন', 'নবজীবন', 'বান্ধব', 'জন্মভূমি', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রচুর ছোটগল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (জৈষ্ঠ, ১২৮০) লেখা 'মধুমতী' গল্পটিই বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোটোগল্প। লেখক ছিলেন পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রাক্-রবীন্দ্র পর্বে সাময়িক পত্রে ছোটগল্প লিখে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের সার্থক সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম পর্বের গল্পে তিনি গ্রামীণ, সহজ-সরল জীবন, নদী ও গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য, আর সাধারণ মানুষের অনুভূতিশীলতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলিতে রয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, জীবনের নানা জটিলতা এবং মনস্তাত্ত্বিক উঠাপড়া। প্রথম পর্বের গল্পে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ 'জীবনের সহৃদয়-রসিক', দ্বিতীয় পর্বে 'জীবনের সমালোচক'। শুধু নানারকম বিষয় নয়, গল্পের বর্ণনা ভঙ্গীতেও নানান বৈচিত্র্য এনেছেন তিনি। কখনও গল্প লিখেছেন উত্তম পুরুষে (অধ্যাপক), কখনও পত্ররীতি (স্ত্রীর পত্র) ব্যবহৃত হয়েছে কখনও বক্তা লেখক (কাবুলিওয়ালা), কখনও কিছুটা বর্ণনা, কিছুটা চিঠি (দর্পহরণ), কখনও নাটকীয় সংলাপে লেখা (কর্মফল), আবার কখনও বা রূপকথার ছলে লেখা (একটা আষাঢ়ে গল্প)।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক একজন বিশিষ্ট তথা অত্যন্ত জনপ্রিয় গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গল্প বলার সহজাত ক্ষমতা, ঘটনা সংস্থাপন, ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য জমাট বন্ধন এবং হালকা সহজ জীবনের কথা তাঁর গল্পের আকর্ষণের মূল কারণ তিনি গল্প লিখেছেন মূলত জীবনের লঘু অংশকে অবলম্বন করেই। রকমারি বিষয় নিয়ে লিখলেও প্রেম এবং দাম্পত্য-জীবন ছিল মুখ্য ভাগ জুড়ে। রমণীয়তা তার গল্পের প্রাণ এবং হিউমার তার দীপ্তি। প্রভাতকুমারের বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'বলবান জামাতা', 'দেবী', 'আদরিনী', 'মাতৃহীন', 'কাশীবাসিনী', 'গহনার বাক্স' ইত্যাদি।

বাংলা ছোটগল্পে এরপর একে একে এলেন শরৎচন্দ্র, ('রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'পরেশ', 'মহেশ', 'মন্দির' ইত্যাদি) প্রমথ চৌধুরী, ('সহযাত্রী', 'বীনাবাঈ', 'ফার্স্টক্লাশ ভূত', 'চারইয়ারী কথা') প্রেমেন্দ্র মিত্র, ('কেরানী', পুন্নাম', 'হয়তো', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁকে', 'স্টোভ' ইত্যাদি) জগদীশ গুপ্ত ('পয়োমুখম্', 'কলঙ্কিত সম্পর্ক', 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন') বুদ্ধদেব বসু, ('জ্বর', 'দুই মা', 'মেজাজ', 'বোন') বিভূতিভূষণ ('উপেক্ষিতা', 'মৌরীফুল', 'ডাইনী') তারাশঙ্কর, ('তারিণী মাঝি', 'অগ্রদানী', 'বেদেনী', 'কালাপাহাড়' ইত্যাদি)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে সময় লেখালেখি শুরু করেন তখন নানারকম টানাপোড়েনে সমাজ বিপর্যস্ত। আগস্ট আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, চোরাকারবার, স্বাধীনতা, নৈতিক অধঃপতন স্বাভাবিকভাবেই এসেছে সমকালীন গল্পে। এই সময়ের গল্পগুলির আঙ্গিকচেতনা জটিল হয়েছে আরও বেশি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আধুনিক গল্পকার হয়েও ঐতিহ্য সচেতন। চিরন্তন আদর্শকে, অতীতের গৌরবকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। দেশ ও দশের প্রতি ভালোবাসা তাঁর সাহিত্য রচনার সংকল্প ও প্রেরণা। আদর্শবাদের নতুন জোয়ারে গা ভাসিয়ে পুরোনো সবকিছুকে তিনি ফেলে দিতে চাননি। আবার 'Creative Evolution'-এর ক্রমান্বয়িত সার্থকতায় তিনি বিশ্বাসী। তাঁর নিজের ভাষায়, "বিবর্তনকে আমরা স্বীকার করব, কিন্তু তাই বলে সেই বিবর্তনের হাতে নিজেদের কখনও অন্ধভাবে সমর্প্ন করব না। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে রয়েছে অচ্ছেদ্য মনোযোগ সুত্র। আমাদের সকলেই প্রায় এই আলোছায়া সমাকীর্ণ ধূলার ধরিত্রীকে ভালোবাসতে চাই, আমাদের মৃত্তিকাকে, আমাদের মানবগোষ্ঠীকে সুন্দরতর বা উন্নততর করবার কল্পনায় আমাদের সভ্যতা বা সাহিত্যকে রচনা করবার চেষ্টা করি।" অতীত এবং বর্তমান, ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মধ্যে শুধুমাত্র বিরোধই শেষ কথা নয়। এদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এবং সংশ্লেষণ, তার মধ্যে এক নতুন আদর্শকে গল্পকার প্রতিষ্ঠা করতে চান। অতীতকে শুধু আঘাত করা নয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অস্তিত্বকে নাকচ করাও নয়। চাই বিরোধ ও সমীকরণ এবং তাদের সমন্বয়। সহানুভূতির দৃষ্টিতে পুরোনো ভুলগুলিকে শুধরে দিয়ে নতুন আদর্শ ও বিশ্বাসের আলোয় তার উত্তরণ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলি এই বিশ্বাসেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে।

১৩.৩ ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ বিচার

সভ্যতার সূচনা থেকেই গল্প শুনছে মানবশিশু। বস্তুত মানুষের একটি পরিচয় হল, সে গল্প শুনতে ভালোবাসে। আমরা জানি গল্পের খিদে ভাতের খিদের পরেই। পৃথিবীর ইতিহাসে গল্প তাই সবচেয়ে প্রাচীন, সর্বাপেক্ষা আদৃত ও সর্বজনগৃহীত। গল্পের উৎসসন্ধানে আমরা বলতে পারি, দু'লক্ষ বছর আগে হাইডেলবার্গের গুহায় বসে মানবশিশু তার দিদিমার কাছে গল্প শুনত" ('কালের পুত্তলিকা'-অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়)। 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, গল্পের জন্মও সেদিন থেকে।" শিশিরকুমার দাশ 'বাংলা ছোটগল্প' গ্রন্থে বলেছেন, 'যুগে যুগে বিচিত্র গল্প সৃষ্টি হয়েছে, তারপর তারা ছড়িয়ে গেছে। আবার কোনও অনামা শিল্পী তাদের কুড়িয়ে নিয়েছে, নতুন করে সাজিয়েছে, নতুন মানুষের কাছে সেই গল্পগুচ্ছ উপহার দিয়েছে। এমনি করে গল্পধারা আদিকাল থেকে বয়ে এসেছে।" আবার ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "গল্প বলার ইতিহাস মানুষের ইতিহাসের মতই সুপ্রাচীন। যাযাবর মানুষের মনে প্রথম যেদিন কথার অজুর দেখা দিয়েছিল সেই কথাকে যেদিন তারা প্রথম রূপ দিতে পেরেছিল ভাষার মধ্যে, মানুষের গল্প বলার আকাঙক্ষা সেই আদিম দিনের।"

সমালোচকরা এটা বলেন যে, গল্পের সূচনা ভারতবর্ষেই প্রথম হয়েছিল। 'জাতক' বা 'জাতকম্মাবন্নন্না'ই হল সেই গল্পকথার প্রথম পরিপূর্ণ নিদর্শন। তবে আধুনিক সাহিত্যে আমরা যাকে ছোটগল্প বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি, সেটা অনেক পরের ঘটনা। সেটা পাশ্চাত্যের অবদান। সেখানে একটা প্রয়োজনের তাড়নায় ছোটগল্প লেখার সূচনা হয়েছিল সেটা হল, অসংখ্য সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার তাগিদ। বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্প বস্তুত নতুন এক শিল্পশাখা নতুনত্ব তার অন্তঃস্বভাবে যেমন, তেমনি তার পোষাক পরিচ্ছদেও। প্রতিটি সৃষ্টিতেই সে নতুনতর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাই একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় তাকে বর্ণনা করা অসম্ভব।

ছোটগল্প যন্ত্রণার ফসল। জীবনের পুরোনো মূল্যবোধগুলো যখন অর্থহীন মনে হতে থাকে, ব্যক্তি চেতনার সঙ্গে, সমাজ চেতনার সঙ্গে কোনওমতেই সামঞ্জস্য ঘটতে চায় না যখন প্রতিমুহূর্তে চারপাশের সঙ্গে শিল্পীর সংঘাত, তখনই হয় গল্পের জন্ম। জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়েই ছোটগল্পের আবির্ভাব। তারপর সেটা বিশিষ্ট একটি শিল্প নির্মাণে পরিণত হয়েছে। সেটা উনিশ শতক। তাছাড়া সংক্ষিপ্ত পরিসর, একটি মাত্র ভাব একটি সংকটের সৃষ্টি করে পাঠককে তৃপ্ত করার সংবাদপত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও গল্প রচনা শুরু হয় এই শতকেই। সংবাদপত্রের পাঠককে চমকিত করে তুলতে গল্পের উপসংহারেও আসে নানা বৈচিত্র্য। তাই উনিশ শতকেই আরম্ভ হয় ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্মাণের কাজ।

ইংরেজ গল্পলেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসন গ্রাহাম বনফ্যুরকে বলেছিলেন, "There are, so far as I know, three ways, and three ways only, of writting a story. You may take a plot and fit characters to it, or you may take a character and choose incidents and situations to develop it, or lastly you may take certain atmosphere, and great actions and persons to realise it." (Life of Stevenson-Balfour)

এখান থেকে আমরা প্লটপ্রধান, চরিত্রপ্রধান, প্রতীতি বা ইমেপ্রসনমুখ্য- এই তিন শ্রেণির গল্পের ইঙ্গিত পাই। এডগার এলান পো প্রতীতি মুখ্য গল্পকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন 'Story of effect'। বস্তুত ছোটগল্পের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা পো-ই প্রথম করেছিলেন। ন্যাথানিয়েল হথর্নের গল্প সংকলন 'Twice Told Tales'-এর সমালোচনায় গ্রাহামস ম্যাগাজিনে তিনি লিখেন, "We allude to the short prose narrative, requiring from a half-hours to one or two hours in its persual... its immense force deriv-able from totality... A skilfull literary artist has constructed a tale with certain unique or simple effect... The idea of the tale has been presented unblemished, because undisturbed...under length is yet more to be avoided." (A. E. Poe, 1842) পো-র পরে ছোটগল্পের যুক্তিগ্রাহ্য একটি সংজ্ঞা দেন ব্রান্ডার ম্যাথুজ,

"The short story fulfills the three unities of the French classical drama, it shows one action, in one place, on one day. A short story deals with a single character, a single event, a single emotion, or the series of emotion called forth by a single situation." (Philosophy of the short story, 1855) তিনি 'Unity of impression'-এ কথাও

বলেছেন যা ছোটগল্পের একটি অন্যতম লক্ষণ। এছাড়াও আরও কয়েকটি সংজ্ঞার উল্লেখ আমরা এখানে করব। যেমন—

(১) ওয়েবস্টার ডিক্সনারি: "A short story usually presenting the crisis of a single problem."

(২) সিয়ান ও 'কাওলেন: "... the short story is an emphatically personal exposition." (The short story)

(৩) আরান রীড:" ....the story typically centres on the inward meaning of a crucial event, on sudden momeritous intutions." (The short story)

(৪) হাডসন: "A short story must contain one and only one informing idea, and that this idea must be worked out its logical conclusion with absolute singleness of method" (An Introduction to the study of Lit erature)

(৫) হাবার্ট গোল্ড: Fine story taller must have a story to tell, not merely some sweet prose to take out for a walk." (Kenton Review- International Symposium on the short story, 1968)

বাংলা ভাষায় ছোটগল্পের সংজ্ঞা নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়েছে অনেকদিন। ছোটগল্পের সংজ্ঞা প্রথম যে বাঙালি আমাদের দিয়েছিলেন, তিনি 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। তিনি বলেছেন, "কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোটগল্প সেই-রূপ জীবনের একটা ঘটনা বর্ণনার চেষ্টা করে।" ১৯১৮ সালে প্রমথ চৌধুরী লিখলেন, "ছোটোগল্প প্রথমত ছোটো হওয়া চাই, তারপরে তা গল্প হওয়া চাই" (ছোটোগল্প)। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বাংলা ছোটোগল্প' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "ছোটোগল্পের উদ্দেশ্য জীবনে একটা বিশেষ ঘটনা, মনের একটি বিশেষ ঘটনা, মনের একটি স্বতন্ত্র ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে স্বাভাবিক পরিণতি সংঘটন সাধন।" তাছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতাটিকেও ছোটগল্পের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা মেনে নিতে পারি,

"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
* **********
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

তবে ছোটগল্পের সমস্ত সংজ্ঞার মধ্যে এখনও পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য বলে আমরা নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়ের সংজ্ঞাকে মেনে নিতে পারি, "ছোটো গল্প হচ্ছে প্রতীতি (impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনি যার একতম বক্তব্য কোনও ঘটনা বা কোনও পরিবেশ বা কোনও মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করেছে।" (সাহিত্যে ছোটোগল্প, ১৯৫৬) তাহলে দেখা যাচ্ছে, সমকালীন সমাজের সঙ্গে গল্পের কিছুটা হলেও সম্পর্ক থাকতে হবে। লেখকের কল্পনাশক্তির সঙ্গে একাত্মতা থাকবে গল্পের। তবে ছোট্ট এই পরিসরে ছোটগল্পের সমস্ত সংজ্ঞা আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবুও আমরা চেষ্টা করব ছোটগল্পের আবশ্যিক লক্ষণগুলিকে তুলে ধরতে---

(১) ছোটগল্প অবশ্যই 'single impression' অর্থাৎ একক প্রতীতিয় উদ্ভাসন ব্যঞ্জনাকে ধারণ করবে।

(২) সেই একক প্রতীতি ব্যক্তিমনের নিজস্ব অনুভূতিকে ব্যক্ত করবে।

(৩) একটা ঘটনা ছোটগল্পে থাকবেই। এবং তাকে হতে হবে অবশ্যই গতিশীল।

(৪) ছোটগল্পের আখ্যানে বাস্তবরস থাকা চাই। রূপকধর্মী হলেও তা হবে বাস্তবের রূপক।

(৫) বাহুল্য বর্জিত হবে সবদিক দিয়ে।

(৬) চরিত্রের সংখ্যা কম হবে।

(৭) পরিণামের দিকে ঋজুগতিতে এগিয়ে যাবে।

এবারে আমরা আলোচনা করব একটি গল্পকে বিশ্লেষণ করার জন্য কী কী প্রস্তুতি নেওয়া উচিত—

(ক) প্রথমেই গল্পের শ্রেণি নির্ণয় করতে হবে।

(খ) তারপরে বিচার্য বিষয় ঘটনাধারা এবং চরিত্র।

(গ) ভাবের একমুখীনতা কতটুকু রক্ষা করা হয়েছে এবং চরিত্র সেই ভাবের উপোযোগী কি না।

(ঘ) চতুর্থ বিচার্য, গল্পটিতে Climax আছে কি নেই।

(ঙ) গল্পের শিল্পরীতি।

(চ) লেখকের জীবনদর্শন গল্পে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে।

(ছ) গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা।

(জ) নামকরণের যৌক্তিকতা।

নামকরণের বিচার যখন আপনারা করবেন তখন বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ এই দু'দিক থেকেই তাকে বিচার বিশ্লেষণ করবেন। বাইরের দিক থেকে ঘটনাপ্রবাহে নামকরণের উপযুক্ত কোনও প্রসঙ্গ এসেছে কিনা সেটা যেমন দেখতে হবে তেমনি আভ্যন্তরীণ বিচারে বা রসবোধে নামকরণোদ্ধৃত ভাব ব্যক্ত হয়েছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। তবেই তার সার্থকতা বিচার সম্ভব।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

ছোটগল্পের প্রসঙ্গে তার পূর্বসুরী 'Fable' আর 'Tale'-এর কথা জেনে রাখা প্রয়োজন। 'Tale' আখ্যায়িকা, 'Fable' কথা আখ্যায়িকা ব্যপ্ত, বিস্তীর্ণ-বহুলতায় পৃথুল। কথা সংক্ষিপ্ত, একমুখী আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল বৃত্তান্ত বা 'An-ecdote'। 'Tale' উপন্যাসেরই সংক্ষিপ্ত রূপ, তা গল্প নয়। বৃত্তান্তের শেষে থাকে একটা স্পষ্ট পূর্ণ যতি। বৃন্তান্ত পাঠের শেষে পাঠকের মনে নতুন কোনও সৃষ্টি

প্রক্রিয়া শুরু হয় না। বৃত্তান্তে যতক্ষণ মানব-চরিত্র বা জীবনতত্ত্বের উপর কোনও আলোকপাত না ঘটছে, ব্যঞ্জনার প্রকাশ না হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে ছোটগল্প বলা যাবে না।

১৩.৪ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও প্রতিভা

১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শৈশবে তার দিদিমা তাকে নারায়ণ বলে ডাকতেন। কিন্তু তাঁর পোষাকী নাম ছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নারায়ণের বাবার নাম প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। মা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। অল্পবয়সেই তিনি মাকে হারান। যদিও মায়ের স্মৃতি ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার, "মা ছিলেন সংসারের লক্ষ্মী প্রতিমার মতো। ছায়ার মতো নিঃশব্দে মা'র চলাফেরা। ঘোমটার আড়ালে কখনও কখনও দেখা যেত তাঁর শুচিশুভ্র ললাটে সকালের আকাশের সূর্যের মতো লাল টকটকে সিদুরের টিপ। লেখকের বাবা ছিলেন পুলিশের দারোগা। দীর্ঘ চেহারার, গৌরবর্ণের সুপুরুষ। নারায়ণ বাবা-মায়ের অষ্টম সন্তান। তাঁরা ছিলেন তিনি ভাই, পাঁচ বোন। বড়দাদা নিখিলনাথ গানবাজনা ভালোবাসতেন। মেজদাদা শেখরনাথ রাজনীতি করতেন। পড়াশোনায় বরাবর ভালো ছাত্র ছিলেন নারায়ণ। দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯৩৫ সালে আই. এ. পাশ করেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে নারায়ণ গ্র্যাজুয়েট হন। তারপর চলে আসেন কলকাতায় ১৯৩৮ সালে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাশ করেন। ১৯৪২ সালে জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে তিনি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ওখান থেকে চলে আসেন কলকাতার সিটি কলেজে। তখন ১৯৪৫ সাল। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ১৯৫৬ সালে। অধ্যাপনাতেও তাঁর সুনাম ছিল কিংবদন্তিতুল্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথমা স্ত্রীর নাম রেণু গঙ্গোপাধ্যায়। তাদের একমাত্র সন্তান বাসবীর জন্ম ১৯৪১ সালে। পরবর্তীকালে তিনি আশাদেবীকে বিয়ে করেন। তাদের একমাত্র পুত্রের নাম অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সাহিত্যে অনুপ্রেরণার জন্য লেখক তাঁর বাবার কাছে ঋণী। তাঁর বাবার লাইব্রেরিতে। নিয়মিত আসত বাংলাদেশের সমস্ত দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকা। লেখক হবার নেপথ্য কাহিনিতে নারায়ণ তাই বলেন, "সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যা কিছু আসক্তি বা অনুরক্তি একান্ত ভাবে বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।" মুখস্থ বলা এবং মনে রাখার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর ছোটবেলা থেকেই। খুব অল্প বয়সেই তিনি একটা সচিত্র হাতে লেখা পত্রিকা বের করেন। নাম ছিল 'চিত্র-বৈচিত্র্য'। 'মাসপয়লা' পত্রিকার ছোটদের বিভাগে 'ডাক' কবিতা লিখে পুরস্কার পান ১৩৩৫ সালে। 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে শুরু করেন কলেজ জীবন থেকে। যুক্তি, বুদ্ধি ও সংবেদনশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিকও ছিলেন তিনি আপারদশি। 'পাশাপাশি' গল্পটি তিনি লেখেন দিনাজপুর স্কুলে পড়ার সময়। তাঁর সাহিত্যের পটভূমি কলকাতা হলেও বারে বারে উত্তরবঙ্গের জীবন ও সংস্কৃতি এসে গেছে। যেমন 'মাসবন',

'বনতুলসী', 'হাঁস', 'বনজ্যোৎস্না', 'টোপ'। পরবর্তী জীবনে গান্ধীবাদী মতাদর্শ ছেড়ে বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী হয়েছিলেন লেখক। যার উদাহরণ 'ইতিহাস', 'নিশাচর', 'বনজ্যোৎস্না', 'নীলা' ইত্যাদি গল্প। ছাত্রাবস্থায় 'তিমিরতীর্থ' উপন্যাস লিখলেও তাঁর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'উপনিষো' যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত গল্প সংকলনের নাম 'বীতংস'। তাঁর টেনিদার গল্পগুলি বাংলা কিশোর সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর প্রতিভার একটি অন্যতম অবদান 'সুনন্দর জার্নাল'। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় এটি ছিল সর্বাধিক পাঠক সমাদৃত রচনা। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭০, প্রতি সপ্তাহে কলামটি প্রকাশিত হয়। বেশ কয়েকটি নাটক এবং চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও লিখেছেন তিনি। অভিনয় ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিয় লেখকদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, তারাশঙ্কর, জীবনানন্দ, চেকভ, গোর্কি, তলস্তয়, মোলাসী, বোদলেয়ার, হোমিংওয়ে, লরেন্স, গ্রাহাম গ্রীণ, সামারসেট সম প্রমূখ। তবে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তিনি সবচেয়ে বেশি। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে লেখক লিখেছেন, "বহুভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্ম নিতে পেরেছি তাঁর জীবনসাধনা আমার আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলতে থাকুক।"

সাহিত্যিক হিসেবে অজস্র পুরস্কার লাভ করেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ক্যালকাটা ক্যামিক্যালের উদ্যোগে কথাশিল্প গল্প প্রতিযোগিতায় পাঠকদের ভোটে তাঁর 'ইতিহাস' গল্পটি শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে পুরস্কৃত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা আয়োজিত 'আনন্দ পুরস্কার' পেয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন সরোজিনী স্বর্ণপদক। 'বসুমতী সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেছেন দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক 'সুনন্দর জার্নাল' প্রকাশের জন্য। এছাড়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিশোর সাহিত্য স্রষ্টা হিসেবে 'রঞ্জিত স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছেন। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অবশ্যই মানুষের ভালোবাসা।

১৩.৫ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প পরিচিতি

বাংলা গল্প বিশ্বে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর গল্পগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে পর্যায়ভুক্ত করে আমরা আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হব। আমরা প্রথমেই আলোচনা করব লেখকের মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলির। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন— "মনস্তাত্ত্বিক শাখাটিও ছোটগল্পের অন্যতম মুখ্য সমৃদ্ধি। এর বিকাশকে সবচাইতে আনুকূল্য করেছেন মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড। গল্প-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে ফ্রয়েডবাদের বিশেষ একটি ভূমিকা রয়েছে। এযুগে এই পর্যায়ী গল্পেই লেখকের শক্তির পরিমাপ করা হয়ে থাকে।" নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কতকগুলি গল্পে আমরা মনস্তত্বকে প্রাধান্য লাভ করতে দেখি। ব্যক্তিমনের নানান জটিলতা, কুটিলতা, বিকার, অবচেতনা এই গল্পগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তবে প্রধানত এখানে আমরা দুটি বিষয় দেখি। একটিতে মানবমনের চৈতন্যময় সন্ধ্যা। অন্যটিতে মানবমনের গহন অন্ধকারে অন্দিতা ও কুটিলতা। অবশ্য মনের প্রসঙ্গ থাকিলেই কোনও গল্প মনস্তাত্ত্বিক হয় না। 'বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে ভূদেব চৌধুরী বলেছেন- "মনোবিকলনের বিশিষ্টতা যেখানে— ছোটোগলো পরিলক্ষিত কেবল সেখানেই তাকে বলি মনস্তাত্ত্বিক গল্প।" মানবমনের জটিল ও বিচিত্র পরিক্রমা আর এর মাধ্যমে জীবনরহস্যের সন্ধান-আমরা নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়ের মনস্তত্বমূলক গল্পের আলোচনায় দেখতে পাব। গল্পকার তাঁর নিজস্ব শিল্পদৃষ্টিতে বৃহত্তর জীবনের হৃদস্পন্দনকে গল্পের বিষয়ীভূত করেছেন। ফলে মানবমনের গভীরে যে ব্যক্তিনিষ্ঠ মনস্তত্ব সেখানেও অনেক সময় যুগজীবন এবং সমাজচেতনার স্পন্দনের অনুরণন শোনা যায়। মানবমনের কুটিলতার প্রকাশ ঘটেছে 'দুর্ঘটনা' গল্পে। একটি স্টোভ দুর্ঘটনায় মুখ পুড়ে যায় স্কুল শিক্ষিকা ইন্দিরা চৌধুরীর। স্বাভাবিক ভাবেই তাকে বঞ্চিত হতে হয় প্রেম, ভালোবাসা দাম্পত্য সুখ থেকে। একই স্টীমারের যাত্রী তরুণ দম্পতি বিভাস আর ইলার সুখকে সে মেনে নিতে পারে না। একটা চাপা আক্রোশে ক্ষতবিক্ষত হয় ইন্দিরা। সে ইচ্ছে করেই বিভাসের নামে কুৎসা রটায়। ফলে চিড় ধরে দাম্পত্যে। আসলে নিজে সুখী নয় বলে অন্যের সুখকে সে মেনে নিতে পারেনি। মনস্তত্বের এটিও একটি দিক। আধুনিক মধ্যবিত্ত মনস্তত্ব উঠে এসেছে 'ফলশ্রুতি' গল্পে। রাজগীর বেড়াতে গিয়ে এক লেখক দম্পতি বিপদে পড়েন। তখন তাদের আশ্রয় দিতে এগিয়ে আসে 'নিরত'-একটি অপরিচিত মেয়ে। তার সহজ, সরল ব্যবহারে তারা উষ্ণতার ছোঁয়া পান অথচ পরের দিন ফিরে আসার পর তাদের মনে হয় নিরত আর তার বিধবা মা ভদ্রঘরের মেয়ে নয়। এও কিন্তু এক ধরনের মনস্তত্ব। 'হরিণের রঙ' গল্পের প্রধান বিষয় এক মরণাপন্ন রোগিনী চেতন-অবচেতনের টানাপোড়েন। তার মগ্নচৈতন্যে অদ্ভুত আলো আর আঁধারের খেলা। আর আছে রঙ। সচেতন মন খুব কম সময়ই থেকেছে। বাকি সমস্তক্ষণ জুড়ে সচেতন মনের অন্তস্থলে গোপনচারী মগ্নতা। তাকে আমরা ধরতে পারিনি চেষ্টা করেও।

'শেষচূড়া' গল্পের নায়ক তার মনের জটিলতা আর অবচেতনের টানাপোড়েনে বিপন্ন। এই বিপন্নতা উঠে আসে স্বপ্ন থেকে। সেই স্বপ্নের মধ্যে অদ্ভুত ঘোর। স্বপ্নতত্ব এবং স্বপ্নব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানের অন্যতম বিষয়। গল্পের নায়ক ভূপেন সেনের বয়েস পঞ্চাশ। স্পোর্টস কোচ। ছোট্ট একটি হার্টঅ্যাটাকের পর হাওয়া বদলের জন্য গয়ায় আসেন। সেখানে প্রতিবেশীর তরুণী কন্যা এনাক্ষীর প্রতি তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। ঈর্ষা জন্মে এনাক্ষীর প্রেমিক অরুণের প্রতি। এই বিকার তাকে শেষপর্যন্ত মৃত্যুর গহ্বরে পৌঁছে দেয়।

'তাস' গল্পে তাস খেলাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিমনের সচেতনতার আড়ালে দু'টি নারী পুরুষের মধ্যে রচিত হয় অবৈধ সম্পর্ক। 'অমনোনীতা' ব্যক্তিমনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও সংকটের গল্প। সন্দেহপ্রবণতা মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সদ্যবিবাহিতা লোকেনের বাড়িতে একদিন নিমন্ত্রণ খেতে এসে সুখেন্দু লোকেনের মনের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করে। যা ধীরে ধীরে মহীরুহের আকার ধারণ করে।

'বনতুলসী' গল্পে দেখি একটি কিশোরকে ভেংচি কেটে পালিয়ে যায় একটি কিশোরী। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে থেকে যায় ছেলেটির মনে। অনেকদিন পর ছেলেটি তখন যুবক, অনুরূপ পরিবেশ এবং উদ্দীপনে একটি সাঁওতাল রমণীর মধ্যে সেই হারানো নায়িকাকে খুঁজে পায়। অবচেতনের সেই আক্রোশ ফিরে আসে। 'ছলনাময়ী' গল্পের দুই পুরুষের জীবনেই রয়েছে নারী সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা। তবুও শেষপর্যন্ত এক ছলনাময়ী নারীর জন্য তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। নারীর প্রতি অতৃপ্ত কামনা এক লহমায় তাদের বন্ধুত্বকে শেষ করে দিয়েছে। আসলে মানবমনের গভীরের রহস্যকে উন্মোচিত করে তার ব্যাপক রূপটিকে গল্পকার তার গল্পের মধ্যে অঙ্কিত করতে চেয়েছেন।

শিল্পী-সাহিত্যিক সমাজেরই একজন। সুতরাং রাজনৈতিক আবর্তের বিস্তৃত প্রভাবকে কোনও সচেতন শিল্পীই এড়িয়ে যেনে পারেন না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন, "যে-কোন সমাজ সচেতন শিল্পীই

সমকালীন রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং দেশ ও জনসাধারণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য গল্প সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।" তাঁর নিজের সম্পর্কেও কথাটি সত্য। 'নিশাচর', 'নীলা', 'ইতিহাস,' 'মমি' ইত্যাদি গল্পে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হলেও বামপন্থী রাজনীতির প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। জীবন বিচ্ছিন্ন এবং তত্ত্বনির্ভর কোনও 'ইজম'কে মেনে নিতে তিনি রাজি ছিলেন না, "আমার কাছে তত্ত্বমুখ্য রাজনীতির কোন সার্থকতা নেই তার পিছনে যে কোনও 'ইজম' ই থাকুক না কেন।" আসলে তার মতে "মানুষের জন্যেই রাজনীতি, রাজনীতির জন্য মানুষ নয়।"

'নিশাচর' গল্পের নায়কের চোখ দিয়ে আমরা দেখি শ্রেণিবৈষম্যের কদর্য রূপ। কেউ উষ্ণ আরামে নিশ্চিন্ত। আবার কেউ ফুটপাতে ঘুমন্ত, বুভুক্ষু। গল্পের নায়ক দেখতে পায় ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছে সর্বহারা মানুষ। একালে ভিখারীর মুখে শোনা যায়, "টাকায় মরচে ধরে যাচ্ছে আর না খেয়ে মরছে ক্ষুধার্ত মানুষ।"

'নীলা' গল্পে স্বদেশ ও স্বজনকে বাঁচানোর চেষ্টায় রত কান্তি সান্যাল আর কুন্তলা বায়। সুগারমিলের শোষিত চাষিদের পাশে দাঁড়ার কান্তি। আর কুন্তলা কৌশলে ম্যানেজারকে সম্মোহিত করে দালালদের শাস্তির ব্যবস্থা করে।

'মমি' গল্পের সংঘাত পিতাপুত্রের। সামন্ততান্ত্রিক প্রথার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসের। সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ রত্নেশ্বর রায় পুঁজিবাদী। প্রজাদের শোষণ করার ইচ্ছে তার রক্তে মিশে আছে। অথচ তারই ছেলে প্রজাদের মধ্যে জমিদারী বিলিয়ে দেয়। কৃষক-সমিতি, লাইব্রেরী, স্কুল গঠন করে। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে সে। এ গল্পে সমাজতন্ত্র গঠনের সূচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় আবেগদীপ্ত কল্পনার, নতুন যুগের ভাবনায় মণীন্দ্র "ট্র্যাকটারের চাকায় লক্ষ বিঘার জমিতে যৌথ মানুষের সোনার ফসলের প্রতিশ্রুতি" দেখতে পায়। আর সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠচেতন পুত্র সহানুভূতির সঙ্গে বিপর্যস্ত, পরাজিত পিতাকে সঙ্গী করে নেয়। দুই আদর্শগত বিরোধের সমীকরণ ঘটে।

'কালনেমি' গল্পের ঘটনাকাল ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগষ্ট। ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হলেও শোষণের বিষাক্ত বীজ থেকেই যায় দেশে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী পরিতোষ বহিষ্কৃত হয় বাগানে সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে। শোষণের বুনিয়াদ মজবুত করার জন্য সাহেব গোর্খা এবং বাঙালিদের মধ্যে বিভাজন ঘটায় কৌশলে। গোর্খাদের 'ডেমোক্রেসি'র লোভ দেখায় কিন্তু হোমল্যান্ডের দাবী নিয়ে গোর্খা নেতা ধনরাজ গুরুং সাহেবের ঘর দখল করে। শোষিত জনগণের চেতনা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের রাজনৈতিক চেতনা বা বিষয় কোন বিশেষ আদর্শ ও বিশ্বাসের মধ্যে গণ্ডীবন্ধ নয়। দেশ ও দশের মঙ্গল কামনায় তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ। এই গল্পগুলিতে তাঁর উদারনীতি, আশাবাদ ও অসাম্প্রদায়িকতার মনোভাব দেখি। আগামী দিনের বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিতটি আমরা এখানে খুঁজে পাই। তত্ত্বগত রাজনৈতিক বিশ্বাসের চেয়ে মানুষের কল্যাণ, মানুষের মুক্তি তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। উদার মানবতার জয়গান গেয়েছেন তিনি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পে প্রকৃতিকে সজীব, সক্রিয় ও জীবন্তভাবে উপস্থাপিত করেছেন। মানব জীবনের পাশাপাশি প্রকৃতিকে এখানে আমরা সহাবস্থান করতে দেখি। তার রূপ বিভিন্ন এবং বৈচিত্র্যময়। সাহিত্যে 'আঞ্চলিকতা'র প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন— "ওই নির্দিষ্ট বিশেষণটি তখনই

কোনও শিল্পীর ওপরে আরোপ করা সম্ভব যখন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো সেই বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সভার প্রতীক হয়ে ওঠে-তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সেই বিশিষ্ট ভিত্তিক্ষেত্রের স্বাভাবিক শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর স্থানিক সাহিত্য হয়েও রসাবেদনে তা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যায়।"

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভাবনা ও শিল্পলোকের বৈচিত্র্য তাঁর সাহিত্য বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের চেয়ে তারাশঙ্করের সঙ্গে তার সাদৃশ্য বেশি। গল্পের প্রাকৃতিক পটভূমি যেখানে উন্মুক্ত, নিরাবরণ, অসংস্কৃত, আদিম ও রহস্যময়, গল্প তার সমস্ত অনুষঙ্গ নিয়ে সেখানে জীবন্ত হয়ে উঠে। প্রকৃতিকে এরকম সতেজ, সক্রিয় ও অপ্রতিরোধ্যভাবে উপস্থাপিত করেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। 'বনতুলসী' গল্পে মানুষ ও প্রকৃতির 'সর্বনাশা' প্রেমকে নায়কের অভিজ্ঞতার উপলব্ধিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রকৃতি ও নারী এখানে সমধর্মী। বনতুলসীর জংলা পটভূমিতে বেড়ে উঠা নায়কের রক্তে মিশে গিয়েছে বনতুলসী গন্ধ। নায়ক নায়িকাকে ভালোবাসে। অথচ নায়িকা তাকে ঠকায়। এটা জানার পর নায়ক তার হিংস্র মহিষ দিয়ে হত্যা করে নায়িকাকে। এবং নির্লিপ্ত ভাবে বিড়ি ধরায়। অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষ ও পশু একাকার হয়ে যায়।

'জান্তব' গল্পে চিরপুরাতন, আদিম জীবনলীলা হিমালয়ের পটভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে। এখানে খাড়া পাহাড়, দুর্ভেদ্য জঙ্গল, তুষার ঝড় ও ঘন কুয়াশায় মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা অদম্য। এ গল্পের নায়ক গুম্ফালামা গুহাবাসী। সঙ্গী বলতে একটি কুকুর। ভয়ঙ্কর প্রলয় শুরু হলে একটুখানি উষ্ণতার জন্য কুকুরটির সঙ্গে তার লড়াই বাধে। উগ্র জীবনতৃষ্ণা ও নির্মম হিংসার প্রিয় কুকুরটিকে সে পাহাড়ের নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর তখনই আকাশ থেকে মেঘ কেটে যায়। রোদ ঝলমল করে উঠে। অনুতপ্ত লামা কুকুরটিকে খুঁজতে বেরোলে একদল বন্য কুকুর তাকে খেয়ে ফেলে। রহস্যময়, দুর্গম পাহাড়ী প্রকৃতি মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

'হাঁস' গল্পে প্রকৃতি যেন মানব চরিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী এক জৈবশক্তি। এই গল্পেও উত্তরবঙ্গের আকাশ, মাঠ আর জলায় বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক পটভূমি। মায়াবিনীর মতো ক্ষণে ক্ষণে সে রূপ বদলায়। গল্পের নায়ক বীরেশ্বর হাঁস ও নারী দুই-ই শিকার করে। নারী সরবরাহ করে অন্ধকার পথে সে অঢেল রোজগার করে। প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসে প্রকৃতি। 'লালশরের' ঝাঁকের পিছনে ছুটে 'দিগদিগন্ত জোড়া মাঠের মধ্যে' বীরেশ্বর পথ হারিয়ে বসে। প্রকৃতি নিজেই একটি সজীব চরিত্র হয়ে নিয়তির মতো নিষ্ঠুরভাবে যেন তার প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করে। 'বনজ্যোৎস্না' গল্পে ডুয়ার্সের 'ছেদহীন অনন্ত অরণ্য' কালো পাহাড় আর জলঢাকা নদীর বিচিত্র পরিবেশে এক জ্যোৎস্নায় মাতাল করা পূর্ণিমা রাতে একটি ভুটানী মেয়ে, নদীর ধারে পলাতক বিপ্লবীকে মূর্ছিত অবস্থায় আবিষ্কার করে। অথচ বন্য লোভ আর জটিলতায় লাঞ্ছিত হতে হয় নায়িকাকে। নায়ককে তার অধিনেতার নির্দেশে স্থানান্তরে যেতে হয়। এখানেও প্রকৃতিকে ঘটনা ও চরিত্রের নিয়ামক রূপে দেখি। 'কালাবদর' গল্পে মাঝির অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব আর তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিফলন ঘটেছে মেঘনা বা কালাবদরের দূরন্ত তাণ্ডবে। 'টোপ গল্পেও প্রকৃতির বিভিন্ন

রূপ দেখা যায়। তেরাইয়ের গভীর জঙ্গলে শিকারের আমন্ত্রণে গিয়ে লেখকের মনে হয়েছে—"প্রকৃতির এমন অপূর্ণ রূপ জীবনে আর দেখিনি।" রাজাবাহাদুরের সঙ্গে রাতের বেলায় শিকারে দিয়ে প্রকৃতির অন্যরূপ দেখা দেয়, "প্রেতপুরীর জমাট অন্ধকার রাত্রির তমসায় আদিম হিংসা সজাগ হয়ে উঠেছে চারিদিকে।" অরণ্যের আদিমতায় মানব শিশুর টোপ দিয়ে বাঘ শিকারের আদিম উল্লাসে মেতে ওঠে মানুষ। "কালো অরণ্যের প্রাধামিক জীবনে প্রকৃতি আর মানুষ যেন একাকার হয়ে যায়।"

রোমান্টিক গল্প পাঠকের কাছে চিরদিনই প্রিয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে রোমান্স ও প্রেম নানাভাবে এসেছে। তবে তা বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নয়। তাঁর রোমান্টিক গল্পগুলিতে প্রকৃতি ও পরিবেশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 'ভোগবতী' গল্পে নবীন কাঠুরিয়া দম্পতির সুখের সংসার। আশেপাশে পাখিরা গান গায়, চান করে। সমস্ত পরিবেশ জুড়ে একটা স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা। কিন্তু এই প্রেম স্থায়ী হয় না। বাস্তবের কঠিন আঘাতে গল্পের শেষে তারা মারা যায়।

'বনজ্যোৎস্যা' গল্পেও রোমান্টিক প্রাকৃতিক পটভূমি। চার পাশে নদী-পাহাড়-অরণ্য। জ্যোৎস্নার ভেসে যাওয়া রাতে ভুটানী মেয়ে নদীতে জল আনতে যায়। ভেসে আসে হরিয়াল, ময়ূরের ডাক। গোটা পরিবেশ জুড়ে মিলনের মাদকতা। যুবতী জানে এমনি রাতেই গোড়ায় চড়ে অভিসারে আসে 'পিতম'। দুজনেই নতুন সংসার পাততে চায়। কিন্তু 'অপরিহার্য জটিলতা' বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বন্য লোভ ও পাহাড়ী প্রতিহিংসায় লাঞ্ছিত হয় নায়িকা। অজান্তেই হারিয়ে যায় বিপ্লবী নায়ক। লোভ-লালসার বাস্তবতায় পুড়ে ছাই হয়ে যায় ভালোবাসার স্বপ্ন। 'কল্পপুরুষ' গল্পে কিশোরী অমিতার সঙ্গে ভালোবাসা হয় শিবেনের। কিন্তু অমিতার বাবা-মা পাত্র হিসেবে নির্বাচিত করেন দীপঙ্করকে। অন্যদিকে শিবেনের সামনে দেখা দেয় নানা বাধা ও সঙ্কট। অমিতার কল্পনা আর শিবেনের সিদ্ধান্তহীনতার টানাপোড়েনে সম্পর্কটাই নষ্ট হয়ে যায়। 'বনতুলসী' গল্পেও উঠে এসেছে একটি অচরিতার্থ প্রেমের কাহিনি। 'উস্তাদ মেহের খাঁ' গল্পেও আমরা দেখি মেহের খাঁ আর আশিক বাঈয়ের ভালোবাসা পরিণতি পায়নি।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে রোমান্টিকতা থাকলেও বাস্তবকে লেখক এড়িয়ে যাননি। আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে লেখকের প্রেমের গল্পের বেশিরভাগই বিয়োগান্তক। বাংলা কিশোর সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি শক্তিশালী নাম। খেয়ালখুশির স্বচ্ছন্দ গতিশীলতায় তিনি তাঁর লেখনীকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তবে তাঁর ছোটগল্পে শিশু ও কিশোর চরিত্র খুব বেশি নেই। 'বনতুলসী' গল্পের প্রথমদিকে নায়ককে কিশোর অবস্থায় দেখি। দেখি কিশোরী নায়িকাকেও। 'রিবণ বাঁধা ভালুক' গল্পেও অল্পবয়সী দু'টি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। 'লালঘোড়া' গল্পের নায়কের বয়স তেরো যে অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসে। 'টুটুল' একটি ছোট ছেলের স্কুল বোর্ডিং থেকে পালিয়ে তার মায়ের কোলে ফেরার গল্প। সময়ে বীভৎস আগ্রাসন থেকে শিশুরাও যে বাদ যায় না তার পরিচয় পাওয়া যায় 'হাড়' এবং 'টোপ' গল্পে। 'হাড়' গল্পে মন্বন্তরের কবলে পড়ে ক্ষুধার্ত একটি ছেলে মহানগরীর রাস্তায় ডাস্টবিন ঘেঁটে হাড়ের টুকরো কুড়িয়ে প্রাণপণে চুষতে থাকে। 'টোপ' গল্পে হিন্দুস্থানী কীপারের মাতৃহারা শিশুর কোনও দাম নেই রাজাবাহাদুরের কাছে। তাই একটি মানবশিশু অনায়াসে বাঘ শিকারের টোপ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাংলা সাহিত্যে মানুষ ও পশুর সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু গল্প রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশ', শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিনী' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন— "পশুপ্রকৃতির মানুষের সঙ্গে পশুর আত্মীয়তাও স্বাভাবিক ধর্ম। তাই এই ধরনের জৈবানুভূতি- সর্বস্ব মানুষের পাশে পাশে পশুও স্নেহ-দুর্বলতা-আত্মচেতনার মৃত্যুবাদ বিদ্ধ হয়েছে।"

'কালাপাহাড়' গল্পের কালাপাহাড় মহিষের সঙ্গে সম্পন্ন বলশালী চাষী রংলালের একটি স্বাভাবিক বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। নদীতীরে চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে রংলালকে বাঁচাতে গিয়ে অন্য মহিষ কুম্ভকর্ণ মারা যায়। আর কালাপাহাড়ের ট্র্যাজিক অপমৃত্যু মানবিক বেদনার অভিসেচন লাভ করে। এছাড়া 'গবিন-সিংয়ের ঘোড়া' গল্পের 'প্রধান' নামের ঘোড়াটিও মানবিক চরিত্রে সার্থক হয়ে উঠেছে। নারীর সঙ্গে নাগিনীর প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক অভিনব চিত্রায়ণ 'নারী ও নাগিনী' গল্পটি। 'সৈনিক' গল্পে সাঁওতালদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে বিশাল হাতি নীলবাহাদুর, যদিও পরিস্থিতির শিকার হয়ে শেষপর্যন্ত সাওতালদের বিষাক্ত তীরে নীলবাহাদুর মারা যায়। 'জান্তব' গল্পে দেখি হিমালয়ের গুহানিবাসী গুম্ফালামার একমাত্র সঙ্গী কুকুর লাঙ্গু। যদিও বেঁচে থাকার লড়াইয়ে লামার কাছে শেষপর্যন্ত হেরে যায় লালু। 'ঘাসবন' গল্পেও মানুষ, পশু ও প্রকৃতি এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। গল্পের নায়ক একটি মহিষাবাথানের মালিক। নায়িকার সঙ্গে গল্পের নায়কের যে প্রতিশোধস্পৃহা, সেখানে যোগ দেয় তার পালিত পশুগুলিও। নায়িকার রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে মহিষের প্রকাণ্ড দুই শিং।

'লালঘোড়া' গল্পের কিশোর নায়কের একটি ঘোড়া রয়েছে 'লালু'। একদিন ছেলেটি ঘোড়ায় চড়ে তীরবেগে নদীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়। মুর্চ্ছিত সেই ছেলেটিকে শেয়ালের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সারারাত পাহারা দেয় লালু। অথচ পরদিন ঘোড়াটাকে খুনি মনে করে তাকে গুলি মেরে হত্যা করে ছেলেটির বাবা।

'দোসর' গল্পে মানুষের সঙ্গী একটি শুয়োর। দুজনেই বাস্তুহারা, স্বজনহীন। নির্জন চরে লোকটির মন কেমন করলে শুয়োরটি তার পাশে এসে দাঁড়ায়। একদিন রাতে পাহাড়ী নদীর হঠাৎ বন্যায় সব ভেসে যায়। মানুষ পশুতে জড়াজড়ি করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে আপ্রাণ। কিন্তু শুয়োরটি ভেসে যায়। চেতনা ফিরে এলে লোকটির মনে হয়, "আমার মতো ওরও তো কোনও দোসর নেই।"

আধুনিক সাহিত্যে, বিশেষ করে বিশ শতকে মিথের ব্যবহার একটি নিয়মিত খানা। মিথ-পুরাণের কাহিনিকে সাহিত্যিকেরা তাঁদের রচনায় গ্রহণ করে তাকে বিরাটত্ব দান করেন। 'মিথ' কথাটির মৌলিক অর্থ মানবসংস্কৃতির সঙ্গে আবহমান কাল থেকে জড়িত কোন না কোন অলৌকিকতা নির্ভর কাহিনি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পৌরাণিক মিথ ব্যবহার করে তাঁর গল্পকে ব্যঞ্জনাময় ও সুদূরপ্রসারী করে তুলেছেন। 'দুঃশাসন' গল্পে একটি মিথ ব্যবহার করা হয়েছে। যা মহাভারত থেকে আগত। সমকালীন যুগের প্রসঙ্গে গল্পকার তাঁর গল্পে দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এক হয়ে গেছে। বঞ্চিত, বস্ত্রহীন সাধারণ মানুষ দ্রৌপদীর মতোই লাঞ্ছিত। একশ্রেণির কাপড় ব্যবসায়ীরা কৃত্রিমভাবে এই বস্তুসংকট তৈরি করেছে। যার ফলে ষোড়শী মেয়ে "সম্পূর্ণ নগ্নভাবে" ঘাট থেকে জল আনে। কারণ যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশবহাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার। 'দুঃশাসনের রক্তপান' নামে একটি পালাগানের কথা আছে গল্পে। যেখানে অর্ধনগ্ন লোকগুলি

দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞা পূরণের মন্ত্রে উৎসাহিত হয়। যারা শোষণ করেছে, তাদের মনেও ভয় জন্মায়, "যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্রা করেছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন?"

'কালনেমি' গল্পে তেমনি এসেছে রামায়ণের প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর রাতারাতি ভোল পাল্টে ফেলে চা-বাগানের ধূর্ত সাহেবরা। প্রকাশ্যে তারা 'বন্দে মাতরম্' গান গায়। কিন্তু গোপনে বাঙালি আর গোর্খাদের মধ্যে ফাটল ধরায়। রামায়ণে আমরা দেখেছিলাম অতিলোভে কালনেমি শেষপর্যন্ত কিছুই পায় না। এখানেও আমরা দেখি সাহেবদের স্বপ্ন শেষপর্যন্ত অধরাই থেকে যায় "যে ডার্টি কুলিগুলোকে ভাটিয়াদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে অধিকারের ব্যবস্থা কায়েম করে রাখবেন ভেবেছিলেন, তারাই নিশ্চিন্তে তারই ঘরে কায়েমী হয়ে বসে আছে।"

সাহিত্যের বিবর্তনের পথে নানা আদর্শের মধ্যে, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে মাঝে মাঝেই বিরোধ দেখা যায়। সাহিত্যে বাস্তবতা ও আদর্শের মধ্যে বিরোধের প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন "traditional অতীত এবং Radical বর্তমানের মধ্যে যে মার্জনাহীন নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব চলেছে, তার মধ্যে যেমন কোনও মধ্যপন্থা অচল, তেমনি কোনও মধ্যপন্থী মনোবৃত্তিও সমান নিন্দিত।" নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আধুনিক গল্পকার হয়েও ঐতিহ্য সচেতন। আদর্শবাদের উগ্রতায় পুরোনো মাত্রকেই ফেলে দিতে নারাজ। তিনি বলেছেন-"বিবর্তনকে আমরা স্বীকার করব, কিন্তু তাই বলে সেই বিবর্তনের হাতে নিজেদের কখনও অন্ধভাবে সমর্থন করব না।"

আধুনিক যুগের বাস্তবতার সংকট পুরোনো যুগের আদর্শকে মেরে ফেলতে চায়। তবুও কেউ কেউ আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে যায়। 'ভাঙাচশমা' গল্পে একজন নবীন শিক্ষককে দেখি, যিনি জীবনে সাচ্ছল্য পেতে স্কুল শিক্ষকের আদর্শভ্রষ্ট হয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে হাকিমের চাকরি গ্রহণ করেন। লোভ আর স্বার্থপরতা তাকে আদর্শচ্যুত করেছে। পাশাপাশি এই গল্পে আমরা আর এক মলিন বস্ত্র, আধপাগলা মাইনর স্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টারকে পাই। সারাজীবনের সাধনায় তিল তিল করে তিনি একটি স্বপ্নের স্কুল গড়েছিলেন, দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে আজ তা বিধ্বস্ত। মনেপ্রাণে যিনি শিক্ষাদানকে ব্রত হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন, আজ তিনি সেই একইভাবে ভালোবেসে ছাত্রহীন ভাঙা স্কুলকেই অশরীরী আত্মার মতো আঁকড়ে থাকেন। বিদ্যার এই পবিত্র তীর্থে শীতের জ্যোৎস্নারাতে অপ্রকৃতস্থের মতো তাঁর ভাঙা চশমার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে ঘোরা ফেরা করেন।

১৩.৬ আলোচিত গল্পের সারসংক্ষেপ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লাঞ্ছিত মানুষের কথা তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে ভাস্বর হয়ে উঠেছে আলোচ্য গল্পে। লেখক গল্পের পটভূমিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তরাইয়ের আরণ্যক পরিবেশ। গল্পটির মধ্যে যে আদিম নৃশংসতা রয়েছে তাকে জীবন্ত করে তুলতে গেলে প্রয়োজন ছিল এই পরিবেশের। গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা। গল্পের শুরুতে আমরা দেখি লেখক একটি পার্সেল পান। পার্সেলটি খুলে দেখেন "একজোড়া ঝকঝকে বাঘের চামড়ার তৈরি চটি।" দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, পায়ে দিতে লজ্জা বোধ হয় দস্তুরমতো। ইচ্ছে করে বিছানায় শুইয়ে রাখি। যিনি পাঠিয়েছেন তিনি রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুর এন.আর.চৌধুরী। যার আমন্ত্রণে আটমাস আগে

লেখক শিকার ধরা দেখতে গিয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গী হওয়ার 'কমপ্লিমেন্টস্' হিসেবেই এই উপহার প্রাপ্তি আর এই জুতো দেখেই লেখকের মনে পড়ে যায় অনেকদিন আগের এক বিচিত্র শিকার কাহিনি। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আলাপের কথা লেখকের ভালো মনে নেই। লেখকের এক বন্ধু রাজাবাহাদুরের এস্টেটে কাজ করতেন। কোন এক উপলক্ষ্যে লেখক দু-চার ছত্রের প্রশস্তি রচনা করে রাজাবাহাদুরের নেকনজরে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝেই চা পানের নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। এলাহি আয়োজন, "চা, কফি, কোকো, ওভালাটি, রুটি, মাখন, পনির, চর্বিতে জমাট ঠান্ডা মাংস। কলা থেকে আরম্ভ করে পিচ পর্যন্ত প্রায় দশ রকমের ফল।"

লেখক একটা দামি ঘড়ি উপহার পেলেন। রাজাবাহাদুরের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তার অন্ধ ভক্তে পরিণত হলেন। বন্ধুরা তাকে মোসাহেব বলে উপহাস করলেও রাজাবাহাদুরের রাজসিক দিন যাপন লেখককে টেনে নিয়ে গেল, "আশ্চর্য, এই জঙ্গলের ভেতরেও এত নিখুঁত আয়োজন। এমন একটা বাথরুমে জীবনে আমি স্থান করিনি। ব্রাকেটে তিন-চারখানা সদ্য পাটভাঙা নতুন তোয়ালে, তিনটে দামী সোপ কেসে তিন রকমের নতুন সাবান, রাকে দামী দামী তেল, লাইম জুস। অতিকায় রাকে ওপরে ঝাঁঝরি (নিচে টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে এখানে ধারাস্নানের ব্যবস্থা। একেবারে রাজকীয় কারবার কে বলবে এটা কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল নয়।"

রাজাবাহাদুর লেখককে শিকারের সরঞ্জাম এবং আয়োজন দেখান, "চারিদিকে সারি সারি নানা আকারের আগ্নেয়াস্ত্র। গোটাচারেক রাইফেল, ছোটবড় নানারকম চেহারা। একটা হকের সঙ্গে অটা একজোড়া রিভলবার ঝুলছে, তার পাশেই দুলছে খোলা একখানা লম্বা শেফিল্ডের তরোয়াল সূর্যের আলোর মতো তার নিষ্কলঙ্ক রঙ। মোটা চামড়ার বেল্টে ঝকঝকে পেতলের কার্তুজ রাইফেলের, রিভলবারের। জরিদার খাপে খানতিনেক নেপালী ভোজালি, আর দেওয়ালের গায়ে হরিণের মাথা, ভালুকের মুখ, নানা রকমের চামড়া বাঘের, সাপের, হরিণের, গো-সাপের। একটা অতিকায় হাতীর মাথা দুটো বড় বড় দাঁত এগিয়ে আছে সামনের দিকে। বুঝলাম এরা রাজাবাদুরের বীরকীর্তির নিদর্শন।" তার রাজসিক আচরণে লেখক যেমন মুগ্ধ, তেমনি কিছুটা ভীতও। শিকারে তার অক্ষমতা প্রকাশ করলে অনুকম্পা দেখান এন. আর. চৌধুরী। তবুও লেখক সেই আরণ্যক প্রকৃতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। গভীর জঙ্গলে রাতের অন্ধকারে শিকারের এই অভিজ্ঞতায় আমরা মুগ্ধ হই, "জঙ্গলের ভেতরে বসে আছি মোটরে দুটো তীব্র হেডলাইটের আলো পড়েছে সামনের সংকীর্ণ পথে আর দুধারের শালবনে। ওই আলোকরেখার বাইরে অবশিষ্ট জঙ্গলটার যেন প্রেত-পুরীর জমাট অন্ধকার। রাত্রির তমসার আদিম হিংসা সজাগ হয়ে উঠেছে চারিদিকে অনুভব করছি সমস্ত স্নায়ু দিয়ে। এখানে হাতীর পাল ঘুরছে দূরের কোনও পাহাড়ের পাথর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে, ঝোপের ভেতরে অজগর প্রতীক্ষা করে আছে অসতর্ক শিকারের আশায়, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় উৎকর্ণ হয়ে আছে হরিশের পাল, আর কোনও একটা খাদের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ। কালো রাত্রিতে জেগে আছে কালো আরগোর প্রাথমিক জীবন।"

জঙ্গলের ভয়ঙ্কর পরিবেশে তিনরাত চেষ্টা করেও রাজাবাহাদুর বাঘ শিকার করতে পারলেন না। লেখক এবার ফেরার প্রস্তাব দিলে তিনি আর একটি দিন থাকার অনুরোধ করেন। আশ্বাস দেন তাকে মাছ

ধরার অভিনব পদ্ধতি দেখাবেন। হাংটিং বাংলোর পেছনে রেলিং দেওয়া সাঁকোর মতো এক পাটাতন। সেখানে দুটো কপিকলের মতো জিনিস। সাঁকোটার নিচেই পাহাড়ি নদীর রেখা। চারশো ফুট নিচে নুড়ি মেশানো সংকীর্ণ রাস্তার দুপাশে জঙ্গল আর জঙ্গল। যাকে রাজাবাহাদুর বলেন, "টেরাইয়ের ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট, ফরেস্টস। একেবারে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব।" এই জঙ্গলে লেখককে মাছধরা দেখাবেন রাজাবাহাদুর। তবে শর্ত হল এই শিকারের কথা কাউকে বলা যাবে না। আর তার পরদিনই লেখককে চলে যেতে হবে। কারণ রাজাবাহাদুর ভালো টোপ না হলে মাছ ধরেন না। এমন সব রহস্যে লেখককে চিন্তায় ফেলে রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর শুতে যাবার আদেশ দিলেন তিনি। সময়মতে লেখককে ডেকে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর রাত যখন গভীর, তখন লেখককে ডেকে তুলে সাঁকোর ওপরে গেলেন। সেখানে শিকারের সব বন্দোবস্ত করাই ছিল। চারশো ফুট উপরের হান্টিং বাংলোর পেছনের কাঠের রেলিং দেওয়া সাঁকোর উপর থেকে একটি কপিকলের সাহায্যে টোপ নামিয়ে নিচে টেরাইয়ের জঙ্গলের কোণ ঘেঁষে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি নদীর নুড়ি বিছানো বালুতটের ওপরে নামিয়ে দিয়ে উপর থেকে বাঘ শিকারই গল্পটির মুখ্য উপজীব্য। তবে এখানেই শেষ নয়-লেখকের সঙ্গে আমরাও স্তম্ভিত হয়ে পড়ি যখন দেখি টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে রাজাবাহাদুরের বাংলোর হিন্দুস্থানি কিপারের বেওয়ারিশ একটি সন্তানকে। কিপারকে কেনাকাটার জন্য শহরে পাঠিয়ে তারই একটি শিশুকে টোপ হিসেবে কাজে লাগিয়ে বিশাল রয়েল বেঙ্গল মেরেছিলেন রাজাবাহাদুর। চুপ থাকার পুরস্কার হিসেবে লেখক পেয়েছিলেন একজোড়া জুতো।

১৩.৭ চরিত্র:

রাজাবাহাদুর

এ গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র রাজাবাহাদুর এন.আর. চৌধুরী। গল্পের মূল হোতা তিনিই। 'টোপ' গল্পের শিকার কাহিনি তাঁর এবং তিনিই শিকারের জন্য অস্বাভাবিক 'টোপ' ব্যবহার করেন। তার চেহারা, পোষাক, বিলাসিতা, মদ্যপান, মেজাজ সবকিছুই যেন সম্মোহিত করার মতো। তাঁর রাজাবাহাদুর উপাধিই যেন তাঁর চরিত্রের আসল ব্যঞ্জনা। একদিকে তিনি অতিথিপরায়ণ, বন্ধুবৎসল। আবার অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক জীবন ও মনের বিকার বীভৎসতায় এক রহস্যময় চরিত্র। তরাইয়ের প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র ভয়ঙ্কর অরণ্যে কয়েকজন চাকরবাকর নিয়ে তার নিঃসঙ্গ বিলাসী দিনযাপন। মদ আর পশু শিকারের বিকৃত উন্মাদনায় তার সময় কাটে। এখানে তিনি রাজা, ক্ষমতার চূড়ান্ত শীর্ষে বাস করেন। চাকরবাকরেরা প্রায় ক্রীতদাস। কিপারের যে ছেলেমেয়েগুলো তার বাংলোর সামনে সারাদিন খেলা করে তাদের তিনি অনুগ্রহের চোখে দেখেন— "দোতলার হামলা থেকে পয়সা, রুটি, কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দেন, নিচে ওরা সেগুলো নিয়ে কুকুরের মতো লোফালুফি করে। রাজাবাহাদুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সকৌতুকে।" এই বিকৃতির জন্যেই তিনি মানুষকে মানুষ বলে মনে করেন না। তার পৃথিবী চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। হুইস্কির রঙিন নেশায় মশগুল রাজাবাহাদুরের কাছে মানবশিশু আর ছাগশিশুর খুব একটা পার্থক্য নেই। তাই আমন্ত্রিত অতিথিকে নিজের শিকার ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে অবলীলায় একটি

মানবশিশুকে 'টোপ" হিসেবে ব্যবহার করেন, "কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাই অস্বাভাবিক নয় তাতে কারও ক্ষতি নেই।"

কথক

রাজাবাহাদুরের বিপরীত প্রান্তে অবস্থান গল্পের কথকের। তাঁর অভিজ্ঞতার rat-rospection, তাঁর-ই মানসিক প্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে গল্পটি। তাঁর চরিত্রের মধ্যেও একটা double personality আমরা লক্ষ করি। একদিকে মোসাহেবি দীনতা ও মধ্যবিত্ত সুলভ লোলুপতা, অন্যদিকে আবার বিবেকের দংশন। যদিও রাজাবাহাদুরের সঙ্গ তাঁর বেশি পছন্দ। কারণ তাঁর মনে হয়, "নৌকা বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখে বাঁধাই ভালো, অন্তত ছোটখাটো ঝড়ঝাপ্টার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।"

তাই শিকারের সহযাত্রী হতে রাজাবাহাদুর নিমন্ত্রণ জানালে সমস্ত কাজকর্ম ফেলে কথক ঊর্দ্ধশ্বাসে বেড়িয়ে পড়েন। রাজাবাহাদুরের বাংলোর রাজকীয় বিলাসদ্রব্য গ্রহণ করেন মধ্যবিত্ত সুলভ লোলুপতায়, আবার রাজাবাহাদুরের সঙ্গে তুলনায় তার হীনমন্যতার প্রকাশও দেখা যায়। কথক প্রকৃতি প্রেমিক, কবি। প্রকৃতির মনোরম এবং ভয়ঙ্কর দুরকম সৌন্দর্যই তিনি উপভোগ করেন। কীপারের ছোট ছোট শিশুগুলিকে দেখে তার মনে হয়,"আরণ্যক জগতে শাল শিশুদের মতো সতেজ আর জীবন্ত" তারা। পরে তাদেরই একজন 'টোপ' হিসেবে ব্যবহৃত হলে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান ঘটনার আকস্মিকতায়। রাজাবাহাদুরের মেজাজ-মর্জির ওপরে নির্ভর করতে হয়েছে তাঁকে। একবার মাত্র প্রতিবাদ করেছিলেন। যখন রাজাবাহাদুরের ছোঁড়া গুলিতে বিশাল বাঘটি শেষ সময়ে একটা থাবা টোপের পুটুলিতে চাপিয়ে লেজ আছড়াচ্ছিল। তখন ক্ষীণ মানবশিশুর চাপা আর্তস্বর শুনে লেখক প্রশ্ন করেছিলেন, "রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ আপনার! কী দিয়ে, আপনি মাছ ধরলেন?" কিন্তু সে প্রতিবাদ ক্ষণস্থায়ী, রাজাবাহাদুরের রাইফেল লেখকের বুকে এসে ঠেকল। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ মারতে না পারলে কেউ রাজা হতে পারে না, "রাজা-রাজড়ার ব্যাপার সবই অলৌকিক। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা।"

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। 'টোপ' গল্পের কথক চরিত্র আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

প্রকৃতি

গল্পের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অরণ্য পরিবেশ একই সঙ্গে সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর। রামগঙ্গা এস্টেটের নিবিড় গভীর শালের বন শ্যামল সমুদ্রের মতো "প্রকৃতির এমন অপূর্ব রূপ জীবনে আর দেখিনি।" অফুরন্ত রোদে ঝলমল করে এখানে প্রকৃতি। পাহাড়ের রঙ গাঢ় নীল। এই প্রকৃতিই আবার হিংস্র রূপ নেয় গল্পের প্রয়োজনে। রাজাবাহাদুরের ভাষায়, "ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট ফরেস্টস্। একেবারে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব।" রাজাবাহাদুর যখন শিকারে মেতে ওঠেন কিংবা যে বাংলোর মৃত্যু ও অমানবিক হিংস্রতার নিষ্ঠুর লালন, তার বর্ণনাও তখন ভয়ঙ্কর রূপে চিত্রিত হয়। খাড়াই পাহাড়ের

উপরে রাজা বাহাদুররের হান্টিং বাংলো। যেন ঝুলে আছে সেই রাক্ষুসে শূন্যতার ওপরে।" শুধু তাই নয়, তার পারিপার্থিব পরিবেশটাও অদ্ভুত, "একটা মৃত্যুর শীতলতা ঢেকে রেখেছে তাকে। একটানা ঝিঁ ঝিঁ র ডাক--চারদিকে অরণ্যে কান্নার শব্দের মতো পত্রমর্মর।" ঐ গভীর শ্বাপদ সংকুল অরণ্যে মানুষও যেন হারিয়ে ফেলে তার সভ্যতা ও মূল্যবোধের অভিজ্ঞান। রাতে শিকার করতে গিয়ে লেখকের মনে হয়, ".....অবশিষ্ট জঙ্গলটা যেন প্রেতপুরীর জমাট অন্ধকার। রাত্রির তমসায় আদিম হিংসা সজাগ হয়ে উঠেছে চারিদিকে..... কালো রাত্রিতে জেগে আছে কালো অরণ্যের প্রাথমিক জীবন।" বর্ণনার মধ্যে ব্যঞ্জনা চিত্রকল্প সংকেতের বিশেষ ব্যবহার রয়েছে। এগুলি নিহিত সম্পর্কে ঐক্যময়। স্টেশন থেকে রাজা বাহাদুরের মস্ত গাড়ি রোলস্ রোয়েস চড়ে যেতে যেতে কথকের মনে হয়েছে, "সমস্ত পৃথিবীটা চাকার নীচে মাটির ডেলার মতো গুঁড়িয়ে যাক। আমি এখানে সুখে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পাড়ি।"

মাছ শিকার দেখতে গিয়ে জ্যোৎস্না রাতে অরণ্যকে দেখে কথকের মনে হয়েছে, "দিগন্ত প্রসার হিংস্র অরণ্য ভাঙা ভাঙা জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছে তরঙ্গিত একটা সমুদ্রের মতো। নিচের নদীটা ঝকমক করছে যেন একখানা খাপখোলা তলোয়ার।" মধ্যবিত্তের চাওয়া-পাওয়া আর প্রকৃতির সৌন্দর্য ও আদিম হিংস্রতা যেন একই তারে বাঁধা। শিকারের গভীর রাতে হান্টিং বাংলোকে দেখে মনে হয়েছে, চারদিকে অরণ্যে কান্নার শব্দের মতো পত্রমর্মর। আর এক অবুঝ ভয়। সব মিলিয়ে আসন্ন কোন ভয়ঙ্কর ঘটনার ইঙ্গিত দেয়। কথকের ভাষায়, "রাজাবাহাদুরের হাতের স্পর্শ বরফের মতো ঠাণ্ডা, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নীরবতার সেই দুর্বোধ্য কুটিল সংকেত।"

১৩.৮ নামকরণ

গল্পের নাম 'টোপ'। গল্পের শেষে দেখা যায় রাজাবাহাদুর চারশ' ফুট নিচের টেরাইয়ের জঙ্গলে উপর থেকে টোপের সাহায্যে শিকার করেন। স্বাভাবিক ভাবেই বাঘশিকারের জন্য ছাগশিশুকে টোপ করা হয়। কিন্তু রাজাবাহাদুরের টোপ একটি মানবশিশু বাহ্যিক দিক দিয়ে গল্পের নামকরণ যেমন সার্থক, তেমনি ব্যঙ্গার্থেও নামকরণ সার্থক। এখানে বাঘের কাছে মানবশিশুই হোক আর ছাগশিশুই হোক টোপ হিসেবে সমান। অন্যদিকে লেখককে সোনার ঘড়ি উপহার দিয়ে শিকারে নিমন্ত্রণ করাতেও একটি টোপই দেওয়া হয়েছে লেখক শিকারের সঙ্গী হয়েছেন আরও কিছু প্রাপ্তির আশায়। আবার কীপারের বেওয়ারিশ মাতৃহারা শিশুদের কাছে রাজাবাহাদুরের ছুঁড়ে দেওয়া পয়সাও একধরনের টোপই। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে মানব শিশুকে টোপ করে বাঘ শিকারের আয়োজন করার মধ্যে। আর এখানেই গল্পের নামকরণ সার্থক।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। 'টোপ' গল্পের নামকরণ আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

১৩.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ

'টোপ' গল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, "টোপ গল্পের ব্যঞ্জনায় 'গরু মেরে জুতো দানে'র রসিকতাটি মর্মান্তিক পরিহাস হয়ে উঠেছে। এ গল্পের রাজাবাহাদুরের শ্রেষ্ঠ ব্যসন হল শিকার। তরাইয়ের প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্বে রাত্রির তমসার যখন হিংসা সজাগ হয়ে উঠে তখন রাজাবাহাদুরের পেগপ্রসাদিত রক্তেও জেগে ওঠে শিকারের হিংস্র উল্লাস। আর তার হান্টিং বাংলোয় শ্রেষ্ঠ শিকারের নাম তিনি দিয়েছেন মাছধরা। পেছনে চারশ' ফুট খাড়া পাহাড়ের নীচে কপিকলের সাহায্যে টোপ ফেলে তিনি এই শিকার ধরেন। আসলে ওটা হিংস্রতম ব্যাঘ্রহননের ছদ্মনামকরণ। রাজবাহাদুরের আবার ভাল টোপ ছাড়া পছন্দ হয় না। তাই একটি ছাগশিশু কিংবা গোবৎসের সাহায্যে অনায়াসে যা করা যেতে পারে, সে কাজ তিনি করেন মানবশিশুকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। সত্য অনেক সময়ই কল্পনার চেয়েও অদ্ভুত। তাই মানবশিশুর তৈরী টোপ এমনকি বাস্তবে সত্য হলেও সারস্বত বিশ্বাসকে বিচলিত করতে হয়। তথাপি কয়েকটি ইঙ্গিতে রাজাবাহাদুরের যে অদ্ভুত হিংস্র চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এবং লেখকের বর্ণনাগুণে যে প্রাণঘাতী অরণ্য পরিবেশ প্রস্তুত হয়েছে, সেখানে এ কল্পনা সম্পর্কে শিল্পপ্রতীতি অনিবার্য হয়ে উঠে। গল্পটি লেখকের শক্তিমত্তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।"

১৩.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারলাম।
- ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গপাধ্যায়ের সম্পর্কে বিশদে জানতে পারলাম।
- টোপ গল্পের সামগ্রিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পেলাম।

১৩.১১ অতিরিক্ত পঠন

- গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ (২০১৪) ছোটগল্পের সীমারেখা; কলকাতা : দে'জ
- ঘোষ বিনয় (২০১৪) মেট্রোপলিটন মন-মধ্যবিত্ত-বিদ্রোহ; কলকাতা : দীপ প্রকাশন
- চৌধুরী ভূদেব (১৩৭২বঙ্গাব্দ); বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার; কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- দাশ শিশিরকুমার (২০১২); বাংলা ছোটগল্প; কলকাতা : দে'জ
- মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার (২০১৯) কালের পুত্তলিকা; কলকাতা : দে'জ
- ভট্টাচার্য তপোধীর (১৪১৭বঙ্গাব্দ) ছোটগল্পের প্রতিবেদন; কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- ভট্টাচার্য তপোধীর (২০০৬); প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব; কলকাতা : দে'জ

- রায়চৌধুরী গোপিকানাথ (১৩৮০ বঙ্গাব্দ); দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য; কলকাতা : দে'জ

✓ ১৩.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংক্ষেপ

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: রাজাবাহাদুরের বিপরীত প্রান্তে অবস্থান গল্পের কথকের। ..... পরে তাদেরই একজন 'টোপ' হিসেবে ব্যবহৃত হলে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান ঘটনার আকস্মিকতায়।..... কারণ তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ মারতে না পারলে কেউ রাজা হতে পারে না, "রাজা-রাজড়ার ব্যাপার-সবই অলৌকিক। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।(দ্রষ্টব্য: ১৩.৮)

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: গল্পের নাম 'টোপ'।..... কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে মানব শিশুকে টোপ করে বাঘ শিকারের আয়োজন করার মধ্যে। আর এখানেই গল্পের নামকরণ সার্থক। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য: ১৩.৮)

? ১৩.১৩ আর্দশ প্রশ্নাবলি

১। ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করে এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২। বাংলা ছোটগল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্বসুরী গল্পকারদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। বাংলা ছোটগল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। সমকালীন গল্পকারদের সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পার্থক্য নিরুপণ করুন।

৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলিকে উদাহরণ-সহ শ্রেণিবদ্ধ করুন।

৬। 'টোপ' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

৭। 'টোপ' গল্পের রাজাবাহাদুর চরিত্রটি আলোচনা করুন।

৮। 'টোপ' গল্পের অন্যতম চরিত্র প্রকৃতি আলোচনা করুন।

*** *** ***